International Research Journal of Interdisciplinary & Multidisciplinary Studies (IRJIMS)
A Peer-Reviewed Monthly Research Journal
ISSN: 2394-7969 (Online), ISSN: 2394-7950 (Print)
Impact Factor: 0.218 (ISRA)
Volume-I, Issue-V, June 2015, Page. 1-7
Published by: Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.irjims.com

পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথী অববাহিকার পূর্বাঞ্চলে বাংলা ভিন্ন অন্যান্য ভাষাভাষীদের ভাষিক প্রবণতার কারণ ও বিশ্লেষণ – একটি আলোচনা

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

Description and dwelling zone in undivided 24 Parganas (North & South) district research area. The SANTAL, The MUNDA, The ORAON, The MALPAHARI, The KHARIYA dialect people in tribal society. Non-Bengali dialect people ORIYA, BHOJPURI and MAITHILY. Dialectical tendency of tribal and Non-Bengali Dialect People arrived in the plane land of the East Ganges. Their eco-social dialectical side. Description and analysis of said tribal and non-Bengali dialect people. Analytical reason and description of their dwelling condition on the background of their arrival general and geographical identity of the colonies. Adjacent States – Bihar, Jharkhand, Odisha- their various Tribal people. Their dialectical characteristics and classification of their Colloquial Language. Specialty and Co-coordinating tendency of Non-Bengali dialect People in the Ganga and Padma river zone. Dialectal Tone mixture in the utterance of Colloquial language.

Key- Words: *Indo Iranion Aryan Language; Dialectical effect or influence; The river side in between the Ganges And the Padma; Educational –Economical- Social condition; The BAMBOO FORD of Titumire; Scheduled Cast and Tribes Welfare Department.*

পশ্চিমবাংলায় মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশই আদিবাসী। এরা সুদীর্ঘকাল ধরেই স্থানীয় বাসিন্দা। বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর মতই এদেরও নিজস্ব উপভাষা এবং তার উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কয়েক হাজার বছর ইন্দো-ইরাণীয় ভাষার বিবর্তন সম্ভূত সংস্কৃতজাত বাংলা ভাষার প্রভাবে থেকেও এদের গোষ্ঠীভাষা তার স্বাতন্ত্র্য হারায়নি। বরঞ্চ বর্তমানে এই স্বাতন্ত্র্য আরও বেশি প্রকট হতে চাইছে নানান ধ্বনির মধ্য দিয়ে। এই আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁড়াও, খড়িয়া, পাহাড়িয়াগণই এ রাজ্যে প্রধান। এরা শুধু রাজ্যের কোন নির্দিষ্ট এলাকারই যে বাসিন্দা তা নয়। কাজের প্রয়োজনে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই এদের দেখা পাওয়া যায়। কোথাও এরা স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পাকাপাকি উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। কোথাও পরিযায়ী চরিত্রের। কাজের বিশেষ মরশুমে অস্থায়ী বাসিন্দা। ফলে দেখা যায় যে, এদের কথাবার্তায়, শব্দ প্রয়োগে নির্দিষ্ট এলাকার ঔপভাষিক প্রভাব সুস্পষ্ট না হলেও অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায়।

গঙ্গা ও পদ্মার দোয়াব অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব-ভাগীরথী অঞ্চলের আদিবাসীদের পরিসংখ্যান হিসেব করতে গিয়ে, মুর্শিদাবাদ জেলার সম্পূর্ণ হিসেব পাওয়া গেলেও, ভাগীরথী নদী দ্বারা দ্বিখণ্ডিত এই জেলার ভগবানগোলা, লালবাগ, বহরমপুর, বেলডাঙ্গা, জলঙ্গী, ডোমকল - মাত্র এই কয়েকটি থানাই আমাদের সমীক্ষাভুক্ত এলাকার মধ্যে পড়ে। এই এলাকা আবার জনসংখ্যার বিচারে শতকরা ষাট শতাংশই মুসলমান ধর্মাবলম্বী সম্প্রদায়ভুক্ত। বাকিরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। এই এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে সবচেয়ে কমসংখ্যক বসতি। এদের মধ্যে ভগবানগোলা এবং ডোমকলেই সবচেয়ে বেশি আদিবাসী আছে। তাও মাত্র কয়েকটি পকেটে। অন্যদিকে প্রায় পরস্পর সংলগ্ন বহরমপুর এবং লালবাগ থানা এলাকাতেও যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে তারা বস্তুতঃ অস্থায়ী বাসিন্দা।

মুর্শিদাবাদ জেলার অবস্থান বিচারে স্পষ্টতই পরিষ্কার যে, এই জেলার আদিবাসীরা জনসংখ্যার অনুপাতে যেমন অতি নগণ্য তেমনি শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থান বিচারেও নিতান্তই দরিদ্র এবং অবহেলিত। বস্তুতঃ এরা যেন সমাজ এবং

প্রশাসনের অবহেলায় বিচ্ছিন্ন। এদের মূল পেশা একমাত্র কৃষি। অতি অল্পসংখ্যক ইঁটভাটার কর্মী। এবং আধা পরিযায়ী শ্রেণির। এ জেলায় দশ-বারোটি আদিবাসীপল্লী সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অন্যদিকে অবিভক্ত চব্বিশ পরগণায় আদিবাসী বসতি ক্রম ক্ষীয়মান। যদিও তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ইতিহাসে সগৌরবে স্থান পেয়েছে, তবু বাদুড়িয়া থানাসহ অন্য দু-একটি থানায় কয়েকটি মাত্র পকেট ব্যতিরেকে। এই জেলায় আদিবাসী পরিসংখ্যান সরকারী তফশিলী জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তরেও যথাযথ নথিভুক্ত নেই। যে তথ্য এই দপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে, তা এতই অসম্পূর্ণ যে তার ভিত্তিতে সার্বিক সমীক্ষা চালানো সম্ভবপর নয়। পঞ্চায়েত দপ্তরেও ব্যাপক কোন তথ্য নেই। আদিবাসী সংরক্ষিত পঞ্চায়েত আসন সংখ্যা বিচার করে, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বয়স-শিক্ষা-পেশা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনাও অসম্ভব।

নদীয়া জেলায় আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মাত্র পার্বত্য অঞ্চলে যারা বাস করে, তারা ব্যতিরেকে প্রায় সবগুলি গোষ্ঠীই বর্তমান। তবে সাঁওতাল, মুণ্ডা, ওঁড়াও, মালপাহাড়ী, খড়িয়া, বুনো-এই কয়েকরকম আদিবাসীদেরই সংখ্যাধিক্য। এদের মধ্যে সাঁওতালরাই আবার সংখ্যাগরিষ্ঠ। এ জেলায় জনগণনা অনুসারে প্রায় চল্লিশ লক্ষ বাসিন্দাদের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষের মত। এই এক লক্ষের পঁয়তাল্লিশ হাজারেরও বেশি সাঁওতাল। ওঁড়াওদের সংখ্যা নয়-দশ হাজারেরও কিছু বেশি। মুণ্ডা জনগোষ্ঠী প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার, মালপাহাড়ী হাজার পাঁচেক, বাকি জনগোষ্ঠী বুনো এবং অন্যান্য। এই অন্যান্যদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে তাদের বিশেষ উল্লেখ অনুল্লেখ্য। এদের মধ্যে কোড়া, গারো, ভূমিজ, মগ, মাহালি ম্রু, লোধা-খড়িয়া এমনকি চাকমা উপজাতির জনগোষ্ঠীরও দু চার দশ একশ জনের হিসেব পাওয়া যায়। কল্যাণী থেকে করিমপুর পর্যন্ত নদীয়া জেলার সীমানা-উত্তরে মুর্শিদাবাদ এবং বাংলাদেশ, দক্ষিণে চব্বিশ পরগণা জেলার পূর্বে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার বনগাঁও মহকুমা এবং বাংলাদেশ, পশ্চিমে বর্ধমান এবং হুগলী জেলা। এই দুই জেলা এবং নদীয়ার মধ্যে প্রবাহিত ভাগীরথী বা হুগলী নদী।

নদীয়া জেলার নিবিড় সমীক্ষার পর মুর্শিদাবাদ এবং চব্বিশ পরগণা জেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অসুবিধা হবার কথা নয়। আসলে এই গবেষকের বাসস্থান নদীয়া হওয়ায় সমীক্ষার প্রথম এবং বিস্তৃত কাজ নদীয়া জেলাতেই প্রথম শুরু হয়। ফলে অবস্থানগত দিক দিয়ে এবং ভাগীরথীর প্রবাহ অনুসরণক্রমে সমীক্ষার ধারাবহকে অনুসরণ করা হয়নি। কোন আগ্রহী পাঠকের হয়তো ভৌগোলিক অসঙ্গতির কথা মনে হতে পারে কিন্তু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোন অসঙ্গতির বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য হবার সম্ভাবনা নেই। এতে বরঞ্চ অন্য একটা দিক থেকেও সাম্যরক্ষা সম্ভব হয়েছে। একদিকে সম্পূর্ণ শিল্পহীন পূর্ণগ্রামীণ জেলা মুর্শিদাবাদ, অন্য দিকে চরম শিল্পায়নের জেলা চব্বিশ পরগণা, মাঝে নদীয়া জেলার বৈশিষ্ট্যই ভাগীরথী পূর্বাঞ্চলের আদিবাসীদের ভাষিক প্রবণতা, প্রভাব এবং বিবর্তন পারস্পরিক প্রভাবের বিবর্তনের ধারাটিকে মূলধন করে বিশ্লেষণ সহজতর হবে বলেই মনে করা হয়েছে।

আদিবাসী সম্প্রদায় পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে প্রায় সব কয়টি প্রধান গোষ্ঠীরই সন্ধান মেলে। মুর্শিদাবাদ এবং চব্বিশ পরগণা জেলায় অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে ধরা হয়েছে। এ জেলাগুলিতে যে প্রধান তিনটি গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ মেলে তারা প্রধানত সাঁওতাল, ওঁড়াও এবং মুণ্ডারী। এদের মধ্যে সাঁওতালরা মোট আদিবাসী জনসংখ্যার সত্তর শতাংশ। সুতরাং মূলত সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকেই এই প্রবন্ধে মুর্শিদাবাদ জেলার উল্লিখিত এলাকাগুলি বেছে নেওয়া হয়েছে। মুণ্ডারী সহ অন্য গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার আদিবাসী বসতিপাড়াগুলি আর্থিক এবং সামাজিক উভয়তই অবহেলিত এবং অনুন্নত, এদের মধ্যে শিক্ষার হার যেমন অনুল্লেখ তেমনি আর্থিক অবস্থাও স্বাধীনতা-উত্তর পঞ্চাশ বছর পরেও উনিশ-বিশ কিছু হয়নি। যেটুকু হয়েছে সে এতই নগণ্য যে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তবে এও সত্য যে এদের মধ্যে সমাজ সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এবং আদিবাসী ও মহিলাদের সংরক্ষণের সুবাদে এদের মধ্যে আত্মসচেতনতার উন্মেষ লক্ষ্য করার মত।

মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানপুর, ভাবতা, ডোমকল এলাকার আদিবাসী জনসংখ্যার নব্বই শতাংশই নিরক্ষর। অঙ্গনওয়ারী প্রকল্পের জন্য এরা অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্রের দেওয়া খাবার সম্পর্কেই বেশি আগ্রহী। সাঁওতাল ছাড়াও ওঁড়াও, কোড়, গারো, ভুটিয়া, মগ, মালপাহাড়িয়া, মাহালি, লেপচা, লোধা-খড়িয়া এবং হো সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীগুলির সাক্ষাৎ মেলে। রাজ্যের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ১.৫৪ শতাংশের বাস এ জেলায়। নদীয়া জেলার চেয়েও এদের সংখ্যা মুর্শিদাবাদে বেশি। জেলায় সমাজকল্যাণ দপ্তর এবং তফশিলি জাতি ও উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের তথ্যানুসারে ১৯৯৫তে এদের সংখ্যা তেতাল্লিশ হাজারের মত। তারা মুর্শিদাবাদ জেলায় গারো চাকমা, ভুটিয়া, মগ, লেপচা এবং লোধা-খড়িয়া, মালপাহাড়ী সম্প্রদায়ের আদিবাসী গোষ্ঠীর বসতি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় সবরকম আদিবাসী জনগোষ্ঠী মিলিয়ে মোট সংখ্যা বর্তমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজারের মত হবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলাকে ভাগীরথী নদী প্রায় সমদ্বিখণ্ডিত করে জেলাকে পূর্ব

পশ্চিমে ভাগ করে উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত। ফলে এই জেলার ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত সালার, আজিমগঞ্জ, কান্দি, খাগড়া, জঙ্গীপুর, নবগ্রাম প্রভৃতি থানা এবং গঞ্জগুলি এই গবেষণার এলাকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সঙ্গত কারণেই। পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে এই জেলার যে এলাকা, সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা তিরিশ হাজারের মত। পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যার হিসেব করে জেলার সরকারী তফশিলী জাতি ও তফশিলী উপজাতি কল্যাণ বিভাগের মোটামুটিভাবে অনুমান এই রকমই। তবে এদের গরিষ্ঠ সাঁওতালরাই। ফলে এই জেলায় মূলত কাজ যা হয়েছে তা সম্পূর্ণই সাঁওতাল এবং মালপাহাড়ী সম্প্রদায়কে নিয়েই।

এই মুর্শিদাবাদ জেলায় সবচেয়ে কম হিন্দীভাষাভাষী মানুষেরা বাস করেন। বিশেষ করে ভাগীরথীর পূর্ব তীর এলাকায়। জেলা প্রশাসনের কাছে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকলেও, সম্প্রতিকালে অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং তফশিলী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে, সার্ভে অনুসারে এই সংখ্যা প্রায় সাড়ে দশ হাজারের মত। এছাড়াও অতি অল্প সংখ্যক পরিযায়ী শ্রেণির মানুষ আছেন, তাদের আলোচ্য বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মুর্শিদাবাদ জেলায় অবাংলাভাষী সম্প্রদায়ের আগমন এবং স্থায়ী বাসিন্দা হিসেবে বাংলা সমাজজীবনের সাথে মিশে, নিজেদের ভাষিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেছেন।

হিসেবটা এইভাবে দেখলে মুর্শিদাবাদ জেলার এক গরিষ্ঠ অংশকেই একদা অবাংলাভাষী বাঙালি বলে চিহ্নিত করা চলে। মুর্শিদকুলি খাঁ যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়ে মুর্শিদাবাদে রাজধানী পত্তন করেন তখন থেকেই এদের আগমন। এই আগমন ঘটেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত। এ জেলায় হিন্দীভাষীদের চেয়ে বরঞ্চ বলা ভালো উর্দুভাষীদের সংখ্যা বেশি। এরা সম্পূর্ণরূপে এখন বাঙালি হলেও এদের ঐতিহ্য অবাংলাভাষী উর্দু। এখনো এরা সংস্কৃতি, ধর্মীয় চর্চায় উর্দুকেই তাদের কথোপকথনের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এরা সকলেই ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনই হোক এরা নবাবী ঐতিহ্যের দাবীদার। তবে এই সম্প্রদায় কালের প্রবাহে এখন কয়েক পুরুষের ব্যবধানে সম্পূর্ণ বাংলাভাষী। যত শুদ্ধ উচ্চারণই করুক না কেন এদের উর্দু কথোপকথন বাংলাভাষীর উর্দু কথোপকথনের মতই। এখানে হিন্দীভাষী জনগোষ্ঠী নদীয়ার মতই। জাতি এবং পেশাগত দিক দিয়ে এরা হয় তফশিলী অথবা অনগ্রসর, শিক্ষার হার নগণ্য। এদের সামাজিক অবস্থানও নিতান্তই অসঙ্গতিপূর্ণ। বিহারের জাতপাতের বিভেদের প্রবাহ থাকায় হিন্দীভাষী হিসেবে একটা সাধারণ সমাজ-জাতপাতের বৈষম্যকে অতিক্রম করে গড়ে উঠতে পারে নি। স্থানীয় সমাজে নিত্য প্রয়োজনের তাগিদে যতটুকু দরকার তার বেশি এদের সম্পর্ক নেই। এদের সামাজিক মেলামেশা অবশ্যই সম্প্রদায়গত। আর জনসংখ্যা কম হওয়ার জন্য সম্প্রদায়গত কোন গোষ্ঠীও তৈরী হতে পারেনি। সাফাইকর্মীদের নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই কাজ করেন। ফলে ভাষিক প্রয়োজনে এদের স্থানীয় যোগাযোগ মাধ্যম বাংলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর্থিক দিক দিয়ে পারিবারিক আয় বিচারে সাফাইকর্মীরা সচ্ছল হলেও এরাই সবচেয়ে অনুন্নত। পেশাগত এবং সাধারণের বিচার বোধের কারণে এদের সামাজিক পরিধি অতি সঙ্কুচিত। শিক্ষার হারও খুব কম। এদের আয়ের একটা বড় অংশই যায় নেশার পিছনে। যেকোন কারণেই হিন্দিভাষী এই গোষ্ঠীর সাথে আদিবাসীদের এই ব্যাপারে মিল নিবিড়। এদের মেয়েরা কাজ করেলেও সচল বলা তদর্থে যথার্থ নয়। অন্য গোষ্ঠীদের মহিলারা সম্পূর্ণতই অচল।

নদীয়ার প্রধান আদিবাসী বসতি এলাকাগুলির প্রধানত হরিণঘাটা, চাকদহ, রাণাঘাট ২নং, রাণাঘাট ১নং, নাকাশিপাড়া, চাপড়া এবং কালীগঞ্জ – এই কয়েকটি ব্লকে। হরিণঘাটা ব্লকের বড়জাগুলি এবং কাষ্ঠডাঙ্গায়; রাণাঘাট ২নং ব্লকে ঘেটুগাছি এবং ধানতলায়; রাণাঘাট ১নং ব্লকে তাহেরপুর; চাকদহ ব্লকে শিমুরালী, মদনপুর; নাকাশিপাড়া ব্লকের মুড়াগাছা; চাপড়া ব্লকের মহেশনগর এবং কালীগঞ্জ ব্লকে বলরামপুরেই প্রধানত এ জেলার স্থায়ী উদ্বাস্তু বসতি এলাকা। আমরা এই কটি এলাকাতেই আমাদের পরীক্ষাভুক্ত এলাকা হিসেবে বেছে নিয়েছি। এই এলাকাগুলির মধ্যে বড়জাগুলি, ঘেটুগাছি, শিমুরালী, মদনপুর, মুড়াগাছা এবং মহেশনগর সাঁওতাল বসতি; কাষ্ঠডাঙ্গা, ঘেটুগাছি, বলরামপুর, শিমুরালী, ধানতলা, মুড়াগাছাতে মুণ্ডাবসতি; মদনপুর, বড়জাগুলি, কাষ্ঠডাঙ্গা এবং পায়রাডাঙ্গায় ওঁড়াও বসতি; মালপাহাড়ি বসতি আছে ধানতলা এবং তাহেরপুরে। বুনো বসতি কাষ্ঠডাঙ্গা, মহেশনগর, ঘেটুগাছিতে।

সাধারণভাবে উপজাতি বসতি গ্রামগুলি ছোট ছোট, পঞ্চাশ থেকে একশ পরিবারের মধ্যে। তবে মদনপুরে ও কল্যাণীতে সাঁওতাল পল্লী এ জেলায় সর্ববৃহৎ। প্রায় হাজার পরিবারের বসতি লক্ষ্য করা যায়। লোক সংখ্যাও প্রায় হাজার চার-পাঁচ। অন্য দিকে মাত্র একশ ষাটটি পরিবারের সাতশ-আটশ বসতিও পাওয়া যায়। নদীয়া জেলায় উপজাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সাঁওতালরাই সর্বপ্রধান। সাঁওতাল উপজাতির মধ্যে এ জেলায় অন্তত দশটি গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে মুর্মুরাই প্রধান। অন্য দুএকটি গোষ্ঠীর সাংখ্যিক অবস্থা এবং বসতি এলাকা আলাদা হলেও তাদের গোষ্ঠীগত বিচ্ছিন্নতা এত বেশি যে আলাদা করে তাদের সমীক্ষা করা দুরূহ। বিশেষত যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধ, ফলে আমরা মুর্মু সম্প্রদায়ের বসতি

গুলিকেই বেছে নিয়েছি। মদনপুর এই সম্প্রদায়ের বৃহত্তম বসতি। মদনপুর স্টেশন থেকে পশ্চিমদিকে দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরত্বে কল্যাণী-মদনপুর রাস্তার পাশে এই বসতি। স্থানীয় এলাকায় এরা সাঁওতাল বলে পরিচিত। এদের পাড়াকেই অনেকে বুনো পাড়া বলে। কিন্তু বাস্তবে এই বসতি এলাকায় এক ঘরও বুনো বসতি নেই। এই সাঁওতাল পল্লীতে প্রায় তিনশর মত পরিবার বাস করে। লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজারের কিছু কম। উল্লেখনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে এই পল্লীতে পুরুষের চেয়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশি। বুনোপাড়া বলে পরিচিতি এই সাঁওতাল পল্লীতেই এ জেলায় শিক্ষার হার সবচেয়ে বেশি। গড় প্রায় আট শতাংশ। এদের মধ্যে পুরুষ তিরিশ শতাংশের কিছু বেশি। মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হার দশ থেকে বারো শতাংশ। এদের পরিবারের সদস্যরা স্কুল-কলেজের পাঠ নিয়েছে। তবে এখানে একটি সাঁওতালী প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকার সুবাদে নতুন প্রজন্মের অনেকেই স্কুলে যায়। অবশ্য প্রাথমিক শিক্ষায় ড্রপআউট, অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণির পাঠ সাঙ্গ করার আগেই তারা মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেয়। এই সংখ্যার শতকরা হার সত্তর শতাংশের মত। বাকি তিরিশ শতাংশেরও দু-চার জন ব্যতিরেকে সবাই পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শ্রেণিতেই পড়া সাঙ্গ করে। তবে বালিকাদের চেয়ে বালকের ড্রপআউটের শতকরা হার এত বেশি নয়।

এপাড়ায় পাকাবাড়ী সাকুল্যে কুড়ি পঁচিশটির মত। ইঁটের দেওয়াল সিমেন্টের গাঁথনি। বাড়ীর ছাদ কংক্রিট ঢালাই নয় দু-চারটি বাদে। বাকী বাড়ীগুলির মধ্যে গোটা চল্লিশেক বাড়ী ইঁটের দেওয়াল। টিনের বা টালির ছাউনি। অবশ্য এদের অনেকগুলির ছাউনি করগেটের টিনের। প্লেনশিট অথবা ক্যানেস্তারার টিনের ছাউনি দেখা মেলে। বেশির ভাগ বাড়ীগুলিরই ছাউনি খড়ের, দেওয়াল মাটির। উল্লেখনীয় ব্যাপার একটাই যে মাটির দেওয়াল হলেও কোন বাড়ীরই জানালা নেই। একটি মাত্র দরজা তাও সংকীর্ণ। এদের গাঁথনিওয়ালা বাড়ীগুলোরও একটির বেশি জানালা নেই। তাও খুবই ছোট জানালা। এই পল্লীর অর্ধেকেরও বেশি পরিবারে কোন চাষের জমি নেই। এরা মূলত কৃষি জমিতে কাজ করে। আর কিছু ইঁটভাটায় কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। যে সব পরিবারের জমি আছে তাদের মাত্র জনা দশ পনেরো পরিবারের জমির পরিমাণ পাঁচ বিঘা বা তার অল্প বেশি। বেশির ভাগ পরিবারেই ভূমিহীন হিসেবে পাট্টায় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া জমি। এরা নিজেরাই চাষ করে। তবে নিজস্ব হাল বলদ আছে গোটা দশেক পরিবারের। এই বুনো পাড়ায় স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কাজ করে। মাত্র বয়স্করাই শিশুদের দেখভালের জন্য বাড়ীতে থাকে। এমনকি কলেজে পড়েছে এমন মেয়েও মাঠে মজুরের কাজ করে। তবে তাদের এই কাজ খুব পেশাদারি নয়। অনেকটাই শৌখিন। যেমন কারও ধান রোওয়ার কাজে ঠিকা নিল। কাজের খুব বেশি চাপ থাকলে শিক্ষিত মেয়েরা যায়। এরা সাধারণভাবে সাঁওতাল রমণীদের পরিধেয় খাট বহরের কাপড় কম পরে। যদিও বাড়ীতে অধিকাংশ সময়ে এ পোশাক পরে। তবে ঝোঁক বাঙালিদের আধুনিক কায়দায় কুঁচি দিয়ে শাড়ি পরার দিকেই।

ভাষিক প্রবণতার দিক দিয়ে এই সাঁওতাল পল্লীকে মিশ্রভাষী বলা যেতে পারে। এদের নিজের মধ্যে কথাবার্তা চালানোর সময় এরা সাঁওতালী এবং স্থানীয় প্রভাবিত বাংলা কথা বলে থাকে। স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তুচ্ছার্থক সর্বনাম মধ্যমপুরুষ ব্যবহার করার দিকে প্রবণতা বেশি। কিন্তু অনেকেই সম্ভ্রমাত্মক সর্বনাম ব্যবহার করেছেন আজকাল। বিশেষ করে যারা চাকুরীজীবী এবং স্কুলে বা তার উচ্চস্তরের শিক্ষা গ্রহণ করেছে। ফলে বলা চলে এদের ঝোঁক অনেকখানি বাংলাভাষীদের নাগরালি বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত। বয়স্ক পুরুষ, অধিকাংশ স্ত্রীলোকই অবশ্যই এ প্রভাব থেকে অনেকখানি মুক্ত। তারা এখনো নাগরালি বৈশিষ্ট্য রপ্ত করতে পারেনি। ভাষিক প্রবণতায় এরা কখনো কখনো কিছু কিছু সম্ভ্রমাত্মক সর্বনাম ব্যবহার করেন বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়েই তাদের সম্বোধনের ব্যবহারের সীমা সমনাত্মক সর্বনাম অর্থাৎ ‘তুমি’ পর্যন্ত। এলাকায় প্রচলিত বাংলায় শব্দের সঙ্গে পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশ শব্দ তারা সামাজিক শব্দ ব্যবহার করে। অর্থাৎ তাদের সামাজিক সম্পর্ক, পূজার্চনা ও দেব-দেবতা এসব সম্পর্কিত শব্দ ব্যবহার করে। তৈজসাদি এবং কিছু উপকরণ জাত শব্দও সাঁওতালী শব্দ। মদনপুরের পরই বড় সাঁওতাল বসতি বড়জাগুলি। এখানে প্রায় আড়াইশ ঘর সাঁওতাল বাস করে। লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজারের মত। মদনপুরের বুনোপাড়ার তুলনায় এখানে সবচেয়ে বড় পার্থক্য যে – এই সাঁওতাল পল্লীর মাত্র জনা চল্লিশেক লোক চাকুরীজীবী। তবে বেশী কিছু পরিবার হরিণঘাটা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি খামারের ঠিকা শ্রমিক, বলা ভাল জনমজুর হিসেবে কাজ করে। শিক্ষার হার পনেরো থেকে কুড়ি শতাংশের মত। পুরুষের মধ্যে এই হার পঁচিশ থেকে তিরিশ। মেয়েদের মধ্যে এই হার আট থেকে দশ শতাংশ। এই বসতি গ্রামের মাধ্যমিক পাশ বা তার চেয়ে বেশি লেখাপড়া জানা একজনও বাস করে না। সবচেয়ে বেশি যে লেখাপড়া জানা তার শিক্ষার মান মাধ্যমিক অনুত্তীর্ণ। তবে বর্তমান প্রজন্মের বালক বালিকাদের অন্তত জনা তিরিশেক ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির মধ্যে পড়াশুনা করে। এখানকার প্রায় সমস্ত পরিবারই ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক।

ভাষা ব্যবহার বড়জাগুলির এই সাঁওতাল পল্লীর বাসিন্দারা নাগরিক সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত নয়। মদনপুরের বুনোপাড়ার বাসিন্দাদের চেয়ে এদের গোষ্ঠীগত মৌলিকত্ব অনেক বেশি পরিমাণে অক্ষুন্ন। ষাটোর্ধ নারীপুরুষ নিজেদের মধ্যে কথা বলার সময় নিরবচ্ছিন্নভাবে সাঁওতালী ভাষা ব্যবহার করে থাকে। এমনকি স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে আলাপচারিতায়ও তারা যে বাংলা ভাষা বলে তার মধ্যে ক্রিয়াপদ সর্বনামের দৌলতে অন্য শব্দগুলির অর্থ বেশ কিছু পরিমাণে অনুমান করে নিতে হয়। তবে কুড়ি থেকে তিরিশ বছর বয়স্ক গোষ্ঠীর ভাষা অনেক বেশি বোধগম্য। এরা যদিও সম্ভ্রমাত্মক ক্রিয়াপদ ব্যবহারে অনভ্যস্ত, তাহলেও সমসাময়িক সর্বনাম ব্যবহার করে থাকে। আলাপচারিতায় অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ।

মুণ্ডা উপজাতি গোষ্ঠীর বাস নদীয়া জেলায় খুব বেশি নেই। জনগণনা অনুসারে এদের সংখ্যা প্রায় হাজার দশেকের মধ্যেই। সামাজিক এবং গোষ্ঠীগত বিচারে এরা সাঁওতালদের তুলনায় অনেক পিছিয়ে। শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠায় এদের অবস্থান করুণ। এ জেলায় চাকদহ, কল্যাণী, কালিগঞ্জ, নাকাশিপাড়া এবং চাপড়া থানাতেই মুণ্ডা উপজাতির বসতি। প্রতিটি বসতি এলাকাই ছোট ছোট, তিরিশ চল্লিশ বা পঞ্চাশটি পরিবারের। সর্বোচ্চ যে বসতিটির সন্ধান পেয়েছি সেখানে মোট পরিবার সংখ্যায় প্রায় শ'দেড়েক। এটি নাকাশিপাড়া থানার মুড়াগাছা গ্রামে। মুণ্ডাদের এ জেলায় মোটামুটিভাবে তিরিশ চল্লিশটি বসতি রয়েছে। জেলার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরও এ সম্পর্কে সঠিক হিসেব রাখেন না। বস্তুত আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাঁওতাল উপজাতি গোষ্ঠী সম্পর্কে এদের আগ্রহ যে পরিমাণ মুণ্ডা, ওঁড়াও, মালপাহাড়ী, খড়িয়া বা বুনোদের সম্পর্কে সচেতনতা সে তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। আসলে বাস্তব অবস্থা হল সবশ্রেণির আদিবাসীদেরই গড়ে সাঁওতাল বলে পরিচয় দেওয়াই প্রশাসনের সাধারণ চরিত্র।

চব্বিশ পরগণা জেলায় সবচেয়ে বেশি যে উপজাতি গোষ্ঠী বাস করে তারা সাঁওতাল। এদের সংখ্যা জেলার আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের দেওয়া অনুমান অনুসারে লক্ষাধিক। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার শুরু একদিকে কাঁচড়াপাড়ার মত বৃহত্তর কলকাতার উত্তর সীমান্ত থেকে বাগদা বনগাঁ। এর পূর্বের সম্পূর্ণটাই বাংলাদেশ। পশ্চিমে কল্যাণীর পর থেকে প্রায় সাগর পর্যন্ত ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ের সম্পূর্ণ অঞ্চল। মাঝখানে কলকাতা শহর। দক্ষিণে সুন্দরবন ও বঙ্গোপসাগর। এর একদিকে নগরায়ণের বিলাস, শিল্পকেন্দ্রের ঐতিহ্য অন্যদিকে তেমনি চরম দারিদ্র্য। অশিক্ষা এবং অন্ধকার। এই জেলার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বৈপরীত্য এতই বিশাল যে দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যের সন্ধান দুরূহ। রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারী দপ্তর থেকে আধাসরকারী দপ্তরে কর্মরত কর্মচারীদের শতকরা পঁচাশি জনই কলকাতাসহ চব্বিশ পরগণায় অবস্থিত। এই সংখ্যার কোন যথার্থ হিসেব পাওয়া না গেলেও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের অনুমান চব্বিশ পরগণায় অন্তত পঞ্চাশ থেকে সত্তর হাজার আদিবাসী আছেন যারা সরকারী দপ্তরে কর্মরত ব্যক্তির পরিবারভুক্ত। এই সরকারী, আধাসরকারী প্রভৃতি দপ্তরে চাকুরীরত আদিবাসীরা গোষ্ঠীগত পরিচয় নিয়ে বাস করেন না। তারা কর্মস্থানের সুবিধার্থে বাসস্থান খুঁজে নিয়েছেন। এরা বস্তুত আদিবাসী সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই বাস করেন। অন্যদিকে এদের মধ্যে শিক্ষিতের হারও সর্বাধিক। প্রশাসনিক উচ্চপদস্থ থেকে করণিক, শিক্ষক, সাধারণ পুলিশকর্মী, শিল্পশ্রমিক বিভিন্ন পেশায় কর্মরত এরা সংরক্ষণের সুযোগে নিয়োগের সুবিধা পেলেও সর্বনিম্ন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হয়েছে এদের। অন্যদিকে সাঁওতালরাই আদিবাসী সমাজের সবচেয়ে বেশি আলোকপ্রাপ্ত। সঙ্গত কারণেই ভাষিক বৈশিষ্ট্যে অগ্রাধিকার পেয়েছেন সাঁওতাল উপজাতির মানুষেরা। চব্বিশ পরগণায় যে সব সাঁওতাল গোষ্ঠীগুলির প্রাধান্য তারা মুর্মু, হেমব্রম, হাঁসদা, টুডু। চব্বিশ পরগণা জেলায় মুর্মু এবং হেমব্রমরাই গরিষ্ঠ। সাঁওতালদের পরেই যে উপজাতি গোষ্ঠী এ জেলায় বেশি তারা মুণ্ডা। সাঁওতাল গোষ্ঠীর তুলনায় এদের মধ্যে শিক্ষার হার খুব কম। সরকারী চাকুরীতেও এদের কেউ প্রশাসনিক কল্যাণ দপ্তর একজনও মাধ্যমিক বা প্রাথমিক শিক্ষকের কথা বলতে পারেননি যিনি মুণ্ডা উপজাতি। তবে জনা কয়েক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী থাকতে পারে বলে তারা জানান। মুণ্ডা উপজাতির মানুষেরা সাধারণত শিকারী। পাখি শিকার করেই এদের জীবিকা। গ্রামে শহরে যে সব নগ্ন গাত্র, অর্ধ নগ্ন এক টুকরো মোটা কাপড় মালকোচা দিয়ে পরে অনেকগুলবি সরু কাঠি কাঁধে করে ঘুরে বেড়ায় তাদের প্রায় সকলেই মুণ্ডা উপজাতি। লম্বা সরু কাঠির মাথায় ছুঁচলো একটি কাঠি, তাতে বিচিত্র আঠা লাগানো। সেই কাঠিগুলি একটার সাথে আর একটা তীক্ষ্ণ তৎপরতায় জুড়ে গাছের মগডালে বসা পাখি শিকারে এরা অব্যর্থ প্রায়। এছাড়াও বনমোরগ, স্বর্ণগোধিকাসহ বুনো প্রাণী এদের প্রধান খাদ্যও। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণেই এই পেশায় এরা ক্রমশই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। এখন মুণ্ডারা মাঠে কাজ করে। মূলত দিনমজুরি এবং কায়িক শ্রমই এদের মুখ্য পেশা হয়ে উঠেছে। এদের মধ্যে শিক্ষার হার এতই নগণ্য যে শতাংশের বিচার করতে যাওয়াও বাতুলতা। বাগদা ব্লকে মুণ্ডা বসতি এলাকায় আই.সি.ডি এসের অঙ্গনওয়াড়ি প্রকল্প আছে। কিন্তু সেখানে অভাবী মুণ্ডা শিশুরা খাবার নিতেও নিয়মিত যায় না। তাদের অনীহা। ফলে এদের মধ্যে সাক্ষরতা নেই বললেই চলে। লোধা উপজাতির কথা জনগণনা প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকলেও এই প্রবন্ধকার তাদের কোন সন্ধান পাননি। তবে বসিরহাটের কাছে একটি পাড়ার

প্রত্যন্তে গুটিকয়েক খড়িয়া উপজাতির গোটা পনেরো পরিবারের সন্ধান মিলেছে। এদের নিজের দেওয়া পরিচয় অনুসারে এরা দুধ-খড়িয়া গোষ্ঠীর। এরা কৃষিজীবী। এদের মধ্যে ব্যক্তিগত জমির পরিমাণ এতই কম যে এদের কৃষিমজুর বলাই ভাল।

এ জেলায় আদিবাসীদের গোষ্ঠী বিচার করলে দেখা যায় যে, সাঁওতাল, ওঁড়াও, কোল, গারো, চাকমা, নাগেসিয়া, ভুটিয়া, ভূমিজ, মগ, মাহালি, মুণ্ডা, মেচ্‌, ম্রু, লেপচা, লোধা-খড়িয়া ও হাজং। এদের মধ্যে সাঁওতাল এবং ওঁড়াওরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সমীক্ষা এলাকার বসতি সম্পর্কে বিবরণ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে কাঁচড়াপাড়ার গ্রাম কাঁচড়াপাড়ার ইঁটভাটা ছাড়া আদিবাসী পল্লী থাকলেও সেখানে সমীক্ষা করা হয়নি। বাগদা বনগ্রাম মহকুমার নদীয়া জেলার সীমান্ত দত্তফুলিয়া সংলগ্ন। দুভাবে যাওয়া যায়। বনগাঁ থেকে অথবা রাণাঘাট থেকে বাসে দত্তফুলিয়া এবং সেখান থেকে সাইকেল ভ্যান অথবা হেঁটে মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের রাস্তা। সম্পূর্ণ গ্রাম নিকটতম রেলস্টেশন এবং শহর নবগ্রাম। বাগদা বিধানসভা কেন্দ্র তফশিলীদের সংরক্ষিত। এই অঞ্চলে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত পঞ্চায়েত আসন রয়েছে। অন্যদিকে বাদুড়িয়ার অবস্থান আরও প্রত্যন্ত। বনগাঁ থেকে সরাসরি বাসে বনগাঁ-বসিরহাট বাসের রুটে মসলন্দপুর থেকে ট্রেকারে এক ঘন্টার বেশি দূরত্বে বাদুড়িয়া। পাকারাস্তা কিন্তু দুর্গম মূল বাদুড়িয়া শহর। বসিরহাট থেকেও যাওয়া যায়। এখানে পুরসভা আছে। মথুরাপুর, জয়নগর এবং বারুইপুরের আদিবাসী পল্লীগুলির মধ্যেও বেছে নেওয়া হয়েছে মথুরাপুর ২নং অঞ্চল, জয়নগর ২নং অঞ্চল এবং বারুইপুরের সন্নিকটস্থ আদিবাসীদের নয়া বসতি। মথুরাপুর এবং জয়নগর দুটি থানাই বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায়। শিয়ালদহ বিভাগে দক্ষিণ শাখায় প্রত্যন্ত এলাকায়। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলা সদর আলিপুর এখন বিভক্ত এবং অনুন্নত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জেলা সদর। আলিপুর কলকাতার প্রান্ত দেশে অবস্থিত হলেও কলকাতার সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু এলাকা। অন্যদিকে প্রদীপের নীচেই অন্ধকারের মতন জয়নগর, মথুরাপুর অনুন্নত। পনেরো কুড়ি বছর আগেও এখানে প্রায় শ'তিনেক পরিবার বাস করত। এখন অর্ধেকেরও কম হয়ে গেছে। অনাদিবাসীরা বসতির প্রয়োজনে গ্রাস করেছে আদিবাসীদের বসতি। এখানকার আদিবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী এরা এসেছে নদী পেরিয়ে। গ্রামে বয়স্ক ব্যক্তি গুরুমুর্মুর কথা অনুসারে সাত আট পুরুষ আগে অর্থাৎ না হলেও শতাব্দী প্রাচীন এদের বসবাস। এরা সকলেই মুর্মু গোষ্ঠী। এরা সেই ট্র্যাডিশনাল ক্ষেতমজুর। এখানে সাক্ষরতার হার পুরুষের মধ্যে চল্লিশ শতাংশের মত। মেয়েদের মধ্যে পাঁচ থেকে দশ শতাংশের মত। চব্বিশ পরগণা জেলার সবকটি আদিবাসী পল্লীর বাসিন্দারা মোটামুটি দ্বিভাষিক। তবে ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন এবং আধুনিকতায় এদের মধ্যে স্থানীয় বঙ্গভাষীদের প্রভাব প্রকট।

পশ্চিমবাংলায় যে জেলাগুলিতে হিন্দীভাষাভাষীদের প্রাধান্য তার মধ্যে চব্বিশ পরগণা জেলাই বোধ হয় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। এ জেলায় হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষেরও অনেক বেশি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী এক-দেড় দশক পর্যন্ত কলকাতার দিকে যে প্রবাহ ছিল ভাগীরথীর মতই নিরবচ্ছিন্ন সেই প্রবাহে বর্তমানে ভাটা পড়লেও তা শুকিয়ে যায়নি। এখনও অব্যাহত। চব্বিশ পরগণার শিল্পাঞ্চলের বিস্তৃতি উত্তরে কাঁচড়াপাড়া থেকে দক্ষিণে ডায়মণ্ডহারবার বজবজ পর্যন্ত। এর মধ্যে আবার কলকাতার উত্তরাংশের চব্বিশ পরগণাতেই শিল্পের বিস্তার বেশি ঘটেছিল। এই বিস্তারের কারণেই রেল পরিবহনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিবেকানন্দ রেল ও সড়ক সেতু নির্মিত হয় প্রাকস্বাধীনতা কালেই। প্রাকস্বাধীনতা কালে চটকল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের জন্য কাঁচড়াপাড়া রেল এলাকায় বেলঘরিয়া পর্যন্ত পাটকলের সারি, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, নৈহাটি, ভাটপাড়া, জগদ্দল, শ্যামনগর, গাড়ুলিয়া, উত্তর ব্যারাকপুর, ব্যারাকপুর, টিটাগড়, পাণিহাটি, কামারহাটি, বরানগর, দমদম পুরসভা এলাকায় ব্যাপক শিল্পায়ন ঘটেছে। সেই সাথে ব্যারাকপুর এবং কাঁচড়াপাড়ায় পূর্বাঞ্চলের দুটি বৃহৎ সেনা ছাউনি। এই শিল্প এবং সেনা ছাউনি ঘিরেই হিন্দীভাষী মানুষ যথা ভোজপুরী, মৈথিলী এবং ওড়িয়া ভাষাভাষীদের বসতি।

তথ্যসূত্র / গ্রন্থঋণ :

১। Das D.M.Banarasi, Language, L.Bloomfield, 1963
২। Chakraborty P.C., The Linguistics Speculations of Hindus, Cal
৩। Potter S., Language in Modern, Penguin Bors. 1964
৪। Das A.K. & Ors., Planning for the ST & SC Castes, Cal 1966
৫। Bose N.K., Some Indian Tribes.
৬। Indo Aryan and Hindis, S.K.Chatterjee, Cal 1969
৭। বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ২০০৯

৮। বসু শুদ্ধসত্ত্ব, বাংলাভাষার ভূমিকা, কলকাতা ১৩৭২

৯। চট্টোপাধ্যায় ধীরেন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষাতত্ত্ব এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্য, কলকাতা ১৯৬৯

১০। বসু দ্বিজেন্দ্রনাথ, বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা, কলকাতা ১৯৭৫

*****